তাওহীদ পন্থীদের নয়নমণি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৮তম অধ্যায়ঃ সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই বনী আদমের কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার এবং সঠিক দ্বীন বর্জন করার কারণ (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين)
রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)

সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই বনী আদমের কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার এবং সঠিক দ্বীন বর্জন করার কারণ

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ‘‘হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করোনা’’। (সূরা নিসাঃ ১৭১)

ব্যাখ্যাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে বাড়াবাড়ি করা হতে সতর্ক করেছেন। এই আশঙ্কায় যাতে এই উম্মতের মূর্খ লোকেরা তাতে লিপ্ত না হয়। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ‘‘হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করোনা’’।

অন্তর ও জবানের মাধ্যমে কারো প্রতি অতিরিক্ত সম্মান করার নাম غلو (বাড়াবাড়ি)। আয়াতের সার সংক্ষেপ হচ্ছে, তোমরা কোনো মানুষকে তার সেই মর্যাদার উপরে উঠাবেনা, যা আল্লাহ তাআলা তাকে প্রদান করেছেন। তা করলে শির্কে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অত্র আয়াতে যদিও আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ-নাসারাদেরকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উম্মতকে সাবধান করা। তারা যেন তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে রকম না করে, যেমন নাসারাগণ করেছিল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা মারইয়ামের সাথে ও ইহুদীরা করেছিল উযাইর (আঃ)এর সাথে।

কবিতা ও গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমেও এবাদতের ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদের মধ্যে শির্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বুসাইরী, বারঈ এবং অন্যান্য লেখকদের কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে এ ধরণের অনেক শির্কী কথা রয়েছে।[1] তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের বিরোধীতা করে বাড়াবাড়ি ও শির্কে লিপ্ত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এক ব্যক্তি যখন বললঃ আপনি আমাদের নেতা, নেতার পুত্র, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র, তখন তিনি এই কথাগুলো অপছন্দ করলেন। যেসব মুর্খ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তারা কি এই কথাগুলো শুনেনি? এই হাদীছের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা সামনে আসবে ইনশা-আল্লাহ। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ(ماشَاء الله وشِئْتَ) অর্থাৎ যা আল্লাহ চান এবং আপনি যা চান, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমান করে দিলে? বরং বল, একমাত্র আল্লাহ যা চান।[2]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেনঃ এই উম্মতের যে ব্যক্তি ইয়াহুদ-নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে এবং সীমালঙ্ঘন ও শৈথিল্যের মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে, সে ইহুদীদের মতই হবে।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেনঃ যে সমস্ত রাফেযী আলী বিন আবু তালীব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে غلو বাড়াবাড়ি করেছিল, তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাবে কেন্দার নিকট তাঁর নির্দেশে খন্দক খনন করে তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে

সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাসের মত এই ছিল যে, তাদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে, কিন্তু আগুন দিয়ে জ্বালানো হবেনা। এটিই অধিকাংশ আলেমের মত।

সহীহ বুখারীতে ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণীঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

‘‘কাফেররা বললঃ ‘তোমরা নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করোনা। বিশেষ করে ‘ওয়াদ’, ‘সুআ’, ‘ইয়াগুছ’ ‘ইয়াঊক’ এবং ‘নসর’কে কখনো পরিত্যাগ করোনা। (সূরা নূহঃ ২৩) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর গোত্রের কতিপয় সৎ ব্যক্তির নাম। তারা যখন মৃত্যু বরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে বুঝিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সেসব জায়গাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মূর্তিগুলোর পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যু বরণ করল এবং পরবর্তীতে আগমণকারী লোকেরা মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস ভুলে গেল, তখনই মুর্তিগুলোর এবাদত শুরু হল।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেন, একাধিক আলেম বলেছেন, ‘যখন সৎ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের কবরের উপর অবস্থান করা শুরু করল। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করল। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের এবাদতে লেগে গেল।

ব্যাখ্যাঃ বুখারীতে বর্ণিত ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিকে লেখক এখানে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন। নূহ (আঃ)এর গোত্রের লোকেরা যে মূর্তিগুলো তৈরী করেছিল, কাল পরিক্রমায় পরবর্তীতে আরবরা এগুলোরই পূজা শুরু করে দিয়েছিল। ওয়াদ্ মূর্তিটি ছিল দাওমাতুল জান্দালে বসবাসকারী কাল্ব গোত্রের। সুওয়া ছিল হুযাইল গোত্রের। ইয়াগুছ নামক মূর্তিটি ছিল মুরাদ কবীলার। পরবর্তীতে সাবার নিকটবর্তী স্থান জুরফে বসবাসকারী গাতীফ গোত্রও এর পূজা শুরু করে দেয়। আর ইয়াউক নামক মূর্তিটি ছিল হামাদান গোত্রের। নাসর ছিল যুল কুলা গোত্রের হিমইয়ার শাখার মূর্তি। এসব মূর্তি ছিল ‘নূহ’ (আঃ)এর গোত্রের সৎ লোকদের আকৃতি ও নামে নির্মিত।

তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যু বরণ করল এবং পরবর্তীতে আগমণকারী লোকেরা মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস ভুলে গেল, তখনই মূর্তিগুলোর এবাদত শুরু হলঃ বুখারীতে রয়েছে, যখন ইলম উঠে গেল, তখনই এই ছবিগুলোর এবাদত শুরু হয়। সুতরাং সৎ লোকদের আকৃতিতে নির্মিত সেই ছবিগুলোই তাদের এবাদতের সিড়ি হিসাবে পরিগণিত হয়। আল্লাহ ব্যতীত যারই এবাদত করা হয়, যেমন কবর অথবা মাজার অথবা মূর্তি অথবা তাগুত বাড়াবাড়িই এগুলোর এবাদতের একমাত্র কারণ। জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট এই কথাটি অজ্ঞাত নয়।

মিশরের অধিবাসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের একই অবস্থা হয়েছিল। তাদের সবচেয়ে বড় মাবুদ হচ্ছে সায়্যেদ আহমাদ বদভী। তার বংশ পরিচয়টিও জানা নেই। তার কোনো ফযীলত, ইলম এবং এবাদত ছিল বলেও জানা যাচ্ছে না। তারপরও সায়্যেদ আহমাদ বদভী হচ্ছে তাদের সর্বাধিক বড় মাবুদ।

তার সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, সে একদা জুমআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে পেশাব করে দিয়েছিল। অতঃপর কোনো নামায না পড়েই মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সাখাভী আবু হাইয়্যান থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

শয়তান মিশরীদের অনেকের জন্য বদভীর এবাদতকে খুব সুশোভনীয় করে দেখিয়েছে। তারা মনে করেছিল, সাইয়্যেদ বদভী পৃথিবীর কার্যাদি পরিচালনা করে, কোথাও আগুন লাগলে তা নির্বাপিত করে এবং ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারের ক্ষমতা রাখে। তারা তাকে মাবুদ, প্রভু এবং অদৃশ্যের জ্ঞানী মনে করেছে। মিশরীরা বিশ্বাস করত, দূর দেশ থেকে তার কাছে ফরিয়াদ করা হলে সে ফরিয়াদকারীদের কথা শুনে এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করে। মিশরীদের কেউ কেউ সায়্যেদ বদভীর মাজারের চৌকাঠে সিজদাও করে।

বহু মিশরী সাইয়্যেদ বদভীর ব্যাপারে যেমন আকীদাহ পোষণ করে, ঠিক তেমনি ইরাক এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক লোক আব্দুল কাদের জিলানীর ব্যাপারে সে রকম আকীদাহ্ই পোষণ করে। আব্দুল কাদের জিলানী ছিলেন পরবর্তী যামানার হাম্বলী মাজহাবের একজন বিখ্যাত আলেম। তার একটি কিতাবের নাম গুনিয়াতুত তালেবীন। হাম্বলীদের মধ্যে তার পূর্বে এবং পরে আরো অনেক আলেম রয়েছেন, যারা ইলম ও এবাদতে তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। তিনিও এবাদত-বন্দেগীতে সুনাম অর্জন করেন। লোকেরা তাকে নিয়ে বিরাট ফিতনায় পড়েছে। যেমন ফিতনায় পড়েছে আহলে বাইতকে নিয়ে শিয়াদের রাফেযী সম্প্রদায়। আব্দুল কাদের জিলানীকে নিয়ে লোকদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পতিত হওয়ার কারণ হলো, তারা মনে করে তার পক্ষ হতে কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। লোকদের বুঝা উচিৎ ছিল যে, কারামত তো তার চেয়ে উত্তম লোকদের থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকেও কারামত প্রকাশিত হয়েছে। মুশরিকদেরও একই অবস্থা। তারাও কোনো না কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ফিতনায় পড়েছে।

সিরিয়ার অধিবাসীদের ইবনে আরাবীর এবাদত উপরোক্ত বিষয়ের চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। সে ছিল ওয়াহদাতুল উজুদে[3] বিশ্বাসীদের ইমাম। পৃথিবীর মধ্যে যত কাফের রয়েছে, তাদের মধ্যে ওয়াহ্দাতুল উজুদে বিশ্বাসীরাই সবচেয়ে বড় কাফের। যারা ইবনে আরাবীকে গুরু মনে করে তাদের অধিকাংশের মধ্যেই দ্বীন এবং সৎচরিত্রের রেশ মাত্র বিদ্যমান থাকেনা। মিশর এবং অন্যান্য দেশেও এ রকম লোক পাওয়া যায়। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের বরকতময় দাওয়াতী ও সংস্কার আন্দোলনের পূর্বে নজদ, হেজাজ, ইয়ামান এবং অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে তাগুত, গাছ, পাথর এবং কবর পূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অঞ্চলের লোকেরা জিনের এবাদতও করত এবং জিনদের কাছে সাহায্য কামনা করত। সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই এসব গুনাহ্এর কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। শয়তান তাদের জন্য এই কাজগুলো সুসজ্জিত ও সুশোভিত করেছে এবং এহেন কু-কর্মে উৎসাহিত করেছে। এসব কিছু করার পিছনে সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়িই একমাত্র কারণ।

সীরাত বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকগণ বলেছেনঃ ইবরাহীম (আঃ)এর যামানা থেকে শুরু করে আরবদের হজ্জের তালবীয়া ছিল এ রকমঃ

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ»

‘‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির হয়েছি। তোমার ডাকে বারবার সাড়া দিয়েছি। তোমার কোনো শরীক নেই’’। অতঃপর আমর বিন লুহাই আল খুযাঈর যামানা আসল। সে একদা তালবীয়া পাঠ শুরু করল। তখন শয়তান একজন শাইখের আকৃতি ধারণ করে তার সাথেই তালবীয়া পাঠ করতে লাগল। আমর বিন লুহাই যখন বলছিলঃ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ হে আল্লাহ! তোমার ডাকে বারবার সাড়া দিয়েছি। তোমার কোনো শরীক নেই’’। তখন শাইখের বেশধারী শয়তান বলতে লাগলঃ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ ‘‘ তোমার কোনো শরীক নেই, তবে তোমার অমুক শরীক রয়েছে’’। তালবীয়ার সাথে এই নতুন সংযোজন দেখে আমর বিন লুহাই শয়তানের প্রতিবাদ করে

বললঃ এটি আবার কী? তখন শয়তান বলতে লাগলঃ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ “ আর তুমি ঐ শরীকেরও মালিক এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুরও মালিক। এবার আমর বললঃ তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই। আমর এভাবেই তালবীয়া পাঠের প্রচলন করল। তার অনুসরণ করে সকল আরব এ তালবীয়াকেই গ্রহণ করে নিল।[4]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

“তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করোনা। যেমন প্রশংসা করেছিল নাসারারা মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)এর। আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে”।[5]

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীছের রাবী হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস উমার ইবনুল খাত্তাব বিন নুফাইল আল আদাভী। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে তিনি ছিলেন এই উম্মতের সর্বাধিক উত্তম সাহাবী। তিনি ছিলেন মুসলিমদের দ্বিতীয় খলীফা। তাঁর খেলাফতকাল ছিল ১০ বছর ৬ মাস। এ সময় ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে তিনি দুনিয়াকে ভরে দিয়েছিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে রোম ও পারস্য বিজয় হয়। ২৩ হিজরী সালের যুল-হজ্জ মাসের ২৩ তারিখে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

لاَ تُطْرُونِى তোমরা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করোনাঃ الإطراء অর্থ হচ্ছে الغلو অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করা, কারও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নাসারারা যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল তোমরা সে রকম আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করোনা। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ ব্যাপারে বলেনঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

“হে আহলেকিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা এবং আল্লাহ্‌র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথা বলোনা। নিঃসন্দেহে মারইয়ামের পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার কালেমা যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং তাঁরই কাছ থেকে আগত একটি রূহ”। (সূরা নিসাঃ ১৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবেঃ এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের কথা-বার্তায় উপরোক্ত সীমা অতিক্রম না করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন রাসূলের উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর বান্দা এ জন্য বলতে হবে যে, আল্লাহর খাস বান্দা হওয়া এবং রেসালাত প্রাপ্ত হওয়াই নবীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّينِ»

“তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে غلو (গুলু) তথা বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করা থেকে সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করার ফলেই ধ্বংস হয়েছে”।[6]

ব্যাখ্যাঃ লেখক এ হাদীছটি রাবীর নাম ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে যে শব্দগুলো এসেছে, তা ইমাম আহমাদ (রঃ) ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেনঃ দ্বীনের ব্যাপারে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। আকীদাহ এবং আমল উভয় ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত এক হাদীছে রাসূল এরশাদ করেছেনঃ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلاَثًا "দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছে"। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম খাত্তাবী (রঃ) বলেনঃ এখানে দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘনকারী বলতে ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা বিনা প্রয়োজনে কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং যুক্তিবাদীদের পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয় জিনিষের অনুসন্ধানে অযথা প্ররিশ্রম করে। তারা এমনসব বিষয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, যা তাদের কোনো উপকারে আসেনা এবং এমন বিষয়ে আলোচনা করে যা তাদের জ্ঞানসীমার পরিধির বাইরে।

আবুস সাআদাত বলেনঃ সীমালংঘনকারী হচ্ছে তারাই, যারা কথায় ও যুক্তিতে বাড়াবাড়ি করে এবং কণ্ঠনালীর শেষ সীমা থেকে অক্ষর উচ্চারণ করে।

ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ উপরে বর্ণিত হাদীছে অল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত মানুষের সাথে কথা বলার সময় গভীর আলোচনা করা, উচ্চাঙ্গের ভাষা ব্যবহার করা, অপরিচিত শব্দ প্রয়োগ করা এবং ব্যাকরণের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম রীতি প্রয়োগ করা অপছন্দনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হোক। ভালোভাবে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন। তাঁর উপর, তার পরিবার বর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

শিরোনামের সাথে এ হাদীছের মিল হচ্ছে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়িই মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়। এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টিসহ পরবর্তী দু'টি অধ্যায় বুঝতে সক্ষম হবে, ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং মানুষের অন্তর পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে এমন আশ্চর্যজনক বস্তু দেখতে পাবে, যা মানুষের বিবেককে হয়রান করে দেয়।

২) এ কথা জানা গেল যে, সৎ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্কের উৎপত্তি হয়েছে।

৩) যে বিষয়ের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে সর্বপ্রথম পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তাও জানা গেল। এর কারণ জানার সাথে সাথে এ কথাও জেনে নেয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলাই নবীদেরকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছেন।

৪) আল্লাহর শরীয়ত এবং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও লোকদের মধ্যে বিদআত কবুল করে নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

৫) উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ। সৎ লোকদেরকে অতিরিক্ত ভালবাসার মাধ্যমেই এর সূচনা হয়। অতঃপর কতিপয় আহলে ইলম ও দ্বীনদার ব্যক্তি সৎ নিয়তে কিছু কাজ করেন। পরবর্তীতে লোকেরা মনে করে উক্ত কাজে আলেম ও সৎ লোকদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ প্রথমে সৎ লোকদের মূর্তি ও ছবি এ নিয়তে বানানো হয় যে, তাদের ছবি দেখলে আল্লাহর এবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ের লোকেরা মনে করে তাদের পূর্ব পুরুষগণ এ মূর্তিগুলোর উসীলা দিয়ে আল্লাহর এবাদত করত অথবা মনে করত এরাই মাবুদ কিংবা আল্লাহর শরীক কিংবা আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী। সুতরাং এরা মানুষের এবাদত পাওয়ার হকদার।

৬) সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৭) মানুষের প্রকৃত অবস্থা হলো, তাদের অন্তর হক কবুল করার প্রতি খুব কমই আগ্রহী থাকে এবং তারা দিন দিন হক থেকে পিছিয়ে যায়। সে তুলনায় বাতিলের প্রতি তাদের অন্তর ক্রমান্বয়ে বেশী অগ্রসর হয়।

৮) এ অধ্যায়ে সালাফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত উক্তির দলীল পাওয়া যায়। তা হচ্ছে বিদআতই কুফরীর কারণ।[7]

৯) বিদআতের পরিণতি কত ভয়াবহ, -শয়তান ভাল করেই তা জানে। যদিও বিদআতকারীর নিয়ত ভাল হয়। এ জন্যই শয়তান আমলকারীকে বিদআতের দিকে নিয়ে যায়

১০) দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা নিষেধ, এই সাধারণ নীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করা জরুরী।

১১) সৎ কাজের নিয়তে কবরের পাশে অবস্থান করার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল।

১২) মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের হিকমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩) শির্ক কাকে বলে তা বুঝতে হলে নূহ (আঃ)এর জাতির সৎ লোকদের ঘটনা জানা জরুরী। এ ঘটনা জানার অপরিসীম গুরুত্ব থাকার পরও লোকেরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ।

১৪) সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বিদআতীরা তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলোতে ঐ ঘটনা পড়ছে এবং তার অর্থও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের উপর পর্দা ঢেলে দেয়ার কারণে তারা বিশ্বাস করে, নূহ (আঃ) এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ এবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটা ছিল কেবল এমন কুফরী, যার ফলে জান-মাল বৈধ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়।

১৫) এটা সুস্পষ্ট যে, নূহ (আঃ)এর জাতির লোকেরা তাদের কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬) তাদের ভুল ধারণা এটাই ছিল যেসব পন্ডিত ব্যক্তি সৎ লোকদের ছবি বা মুর্তি তৈরী করেছিল, তারাও শাফাআত লাভের আশা পোষণ করত।

১৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে এ কথার প্রমাণ মিলে। তিনি বলেছেনঃ তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করোনা যেমন খৃষ্টানরা মারইয়াম তনয়ের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করত। নবীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি সুস্পষ্ট করে সত্যের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

১৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯) নূহ (আঃ)-এর জাতির ঘটনার মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার পূর্বে এবং জ্ঞানীদের মৃত্যু বরণ করার পূর্বে সৎ লোকদের ছবি বা মূর্তিগুলোর পূজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা গেল।

২০) আরো জানা গেল যে, আলেমগণের মৃত্যু বরণের মাধ্যমেই ইলমে দ্বীন উঠে যায়।

ফুটনোট

[1] - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কিছু দৃষ্টান্তঃ সুফীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূরের তৈরী মনে করে। তারা এই বানোয়াট হাদীছটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে أول ما خلق الله تعالى نوري অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন শব্দে একই অর্থে সুফীদের কিতাবে সনদবিহীন এই বানোয়াট হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ সুন্নী মুসলমানও এই আকীদাই পোষণ করে থাকে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীছের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী ছিলেন না এবং তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টিও ছিলেন না। সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون»

‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে জিনিষটি সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে কলম। তারপর কলমকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে বললেন। (সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ১৩৩) তিনি আরো বলেনঃ

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

‘‘আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেনঃ লিখ। কলম বললঃ হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ্ বললেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী প্রতিটি বস্ত্তর তাকদীর লিখ’’।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরীও ছিলেন না। তিনি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ‘‘হে নবী! তুমি বল যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ’’। (সূরা কাহাফঃ ১১০) এ ছাড়া কুরআনের আরও অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী আদমেরই একজন ছিলেন। সুতরাং সমস্ত বনী আদম যেহেতু মাটির তৈরী, তাই তিনিও একজন মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। কেবল ফেরেশতাকেই আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ

বুখারীতে আয়েশা (রাঃ)এর হাদীছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»

‘‘ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া বিহীন অগ্নি থেকে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্ত্ত থেকে যার বিবরণ তোমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে’’। (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং তিনি মাটির তৈরী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে নবুওয়াত ও রেসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এতেই তাঁর সার্থকতা ও সম্মান নিহিত রয়েছে, অন্যথায় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সুফীরা আরো বিশ্বাস করে যে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টি জগতের কুববা তথা গম্বুজ। তিনি আরশে সমাসীন। সাত আসমান, সাত যমীন আরশ-কুরসী, লাওহে মাহফুয, কলম এবং সমগ্র সৃষ্টি জগৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথার সত্যতা যাচাই করতে বুসেরীর কাসীদাতুল বুরদার একটি লাইন দেখুনঃ

فإنَّ من جودك الدنيا وضرَّتها + ومن علومك علم اللوح والقلمِ

হে নবী! তোমার দয়া থেকেই দুনিয়া ও আখেরাত সৃষ্টি হয়েছে। আর আপনার জ্ঞান থেকেই লাওহে মাহফুয ও কলমের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে। সুফীদের কতিপয় লোকের বিশ্বাস যে, তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি। এটিই প্রখ্যাত সুফী সাধক ইবনে আরাবী ও তার অনুসারীদের আকীদা। কতিপয় সুফীবাদের মাশায়েখ এমতকে সমর্থন করেন না; বরং তারা এ কথাগুলোর প্রতিবাদ করেন এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ মনে করেন ও তাঁর রেসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তবে তারা রাসূলের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করেন, আল্লাহর কাছে তাঁর উসীলা দিয়ে দুআ করেন এবং বিপদে পড়ে রাসূলের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। ঐ দেখুন বুসেরী তার কবিতায় কি বলেছেনঃ

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به + سواك عند حلول الحوادث العمم

হে সৃষ্টির সেরা সম্মানিত! আমার জন্য কে আছে তুমি ব্যতীত, যার কাছে আমি কঠিন বালা মসীবতে আশ্রয় প্রার্থনা করবো? (নাউযুবিল্লাহে) সুফীবাদের সমর্থক ভাইদের কাছে প্রশ্ন হলো বুসেরীর কবিতার উক্ত লাইন দু’টির মধ্যে যদি শির্ক না থাকে, তাহলে আপনারাই বলুন শির্ক কাকে বলে এবং তা কোথায় পাওয়া যায়? না কি এই উম্মত শির্কমুক্ত? পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে শির্ক মিশ্রিত এ জাতীয় কবিতা পাঠ্য করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এগুলো পাঠ করে ইসলামী শিক্ষার নামে শির্ক ও বিদআতী শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ যদি শির্ক মিশ্রিত সিলেবাস

নির্ধারণ করে তা দিয়ে আমাদের জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে আমরা তাওহীদের সঠিক শিক্ষা পাবো কোথায়?

[2]- কিন্তু যদি এভাবে বলা হয়, ((ماشَاء الله ثم شِئْتَ অর্থাৎ আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান, তাহলে কোন সমস্যা নেই। শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, وَاوْ)_ওয়াও) দ্বারা দু'টি বিষয়কে এক সাথে মিলিত করলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ের মধ্যে সাম্যতা বুঝায় অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি পরস্পর সমতুল্য হওয়া বুঝায়। সুতরাং যে ব্যক্তি বললঃ (ماشاء الله وشئت) অর্থাৎ যা আল্লাহ চান এবং আপনি চান, সে বান্দার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে সমান করে দিল। তবে (ثم_ছুম্মা) এর মাধ্যমে দু'টি বস্তুকে একত্রিত করলে এ রকম কোন সন্দেহ থাকেনা। সুতরাং যে ব্যক্তি বললঃ (ماشاء الله ثم شئت) অর্থাৎ আল্লাহ্ যা চান অতঃপর আপনি যা চান, সে এ কথা স্বীকার করল যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী ও পরে হয়ে থাকে এবং তা কেবল আল্লাহর ইচ্ছার পরেই কার্যকরী হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ "আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না"। (সূরা আল-ইনসানঃ ৩০)

[3] - ওয়াহ্দাতুল উজুদের এর তাৎপর্য হলো, সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একই জিনিষ। অর্থাৎ সৃষ্টিজীব এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উভয়ই এক ও অভিন্ন। ইবনে আরাবী এ মতেরই সমর্থক ছিল। তার মতে পৃথিবীতে যা আছে সবই মাবুদ। অর্থাৎ সবই সৃষ্টি এবং সবই স্রষ্টা। এ অর্থে কুকুর, শুকর, বানর এবং অন্যান্য নাপাক সৃষ্টিও মাবুদ হতে কোন বাধা নেই। সুতরাং তার মতে যারা মূর্তি পূজা করে তারা আল্লাহরই এবাদত করে। (নাউযুবিল্লাহ) ইবনে আরাবীর মতেঃ

إن العارف المكمل هو من يرى عبادة الله والأوثان شيء واحد

অর্থাৎ পরিপূর্ণ মারেফত হাসিলকারীর দৃষ্টিতে আল্লাহর এবাদত ও মূর্তিপূজা একই জিনিষ। ইবনে আরাবী তার কবিতায় বলেনঃ

العبد رب والرب عبد * يا ليت شعري من المكلف

إن قلت عبد فذاك حق * أو قلت رب فأنى يكلف

বান্দাই প্রভু আর প্রভুই বান্দা। আফসোস যদি আমি জানতাম, শরীয়তের বিধান কার উপর প্রয়োগ হবে? যদি বলি আমি তাঁর বান্দা অথচ এ তো রব। আর যদি বলি আমিই রব তাহলে শরীয়ত মানার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? উপরোক্ত কারণ এবং আরও অসংখ্য কারণে আলেমগণ ইবনে আরাবীকে গোমরাহ বলেছেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা কখনই এক হতে পারে না। আল্লাহ্ ব্যতীত বাকী সকল বস্তু হচ্ছে সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবক। কিরূপে আল্লাহ্র পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি

যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (সূরা আনআমঃ ১০১) কুরআন ও সহীহ হাদীছে দিবালোকের মত পরিস্কার করে বলা আছে যে, মহান আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত, তার গুণাগুণ সৃষ্টি জীবের গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিরাট সংখ্যক মুসলিম ওয়াহ্দাতুল উজুদে বিশ্বাসী। ফাযায়েলে আমাল বইয়ে গাঙ্গুহী তার মোরশেদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর খেদমতে লিখিত এক চিঠিতে বলেনঃ -------অধিক লেখা বে-আদবী মনে করিতেছি। হে আল্লাহ! ক্ষমা কর, হজরতের আদেশেই এই সব লিখিলাম, মিথ্যাবাদী, কিছুই নই, শুধু তোমারই ছায়া, আমি কিছুই নই, আমি যাহা কিছু সব তুমিই তুমি। (দেখুনঃ ফাযায়ে আমাল, দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা) এই কথাটি যে একটি কুফরী কথা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসুন আমরা এই বাক্যটির ব্যাপারে আরব বিশ্বের আলেমদের মূল্যায়ন জানতে চেষ্টা করি। তাদের কাছে উপরের বাক্যটি এভাবে অনুবাদ করে পেশ করা হয়েছিল।

إن إطالة الكلام سوء الأدب اللهم اغفر فإنما كتبت كل هذه بأمر الشيخ أنا كذاب أنا لا شيء إنما أنا ظلك أنا لا شيئ وما أنا هو أنت

অনুবাদটি শুনে তারা বলেছেনঃ شرك محض অর্থাৎ এটি খাঁটি শির্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

[4]- এই ঘটনার কোন সঠিক সনদ পাওয়া যায়নি।

[5] - বুখারী ও মুসলিম। অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তুমি কিতাবে মারইয়ামের কথা স্মরণ করো।

[6] - নাসাঈ, ইবনে মাজাহ মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল এবং অন্যান্য। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন যিলালুল জান্নাত। হাদীছ নং- ৯৮।

[7] - তা ছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে বিদআতকেই বেশী পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তাওবা করা সহজ হলেও বিদআত থেকে তাওবা করা সহজ নয়। কারণ বিদয়াত তো ছাওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়। তাই এতে পাপের অনুভূতি থাকে না। তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12065

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন